ঐতিহ্যবাহী কলাইয়ের রুটি বিক্রি করে বেঁচে থাকা

উদিসা ইসলাম

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, রাজশাহী অঞ্চলে বিশেষ কী পাওয়া যায় যা অন্য জায়গায় হাজার খুঁজলেও পাবেন না? উত্তরে এক কথায় যা আসবে তা হলো রাজশাহীর চাঁপাই নবাবগঞ্জের বিখ্যাত আম আর চর অঞ্চলে জন্মানো কলাইয়ের রুটি। আম নবাবগঞ্জ ছাড়াও অনেক জায়গায় হয় বটে তবে সেগুলোর স্বাদ এ অঞ্চলের মতো নয়। কিন্তু কলাইয়ের রুটি আপনি কোথাও পাবেন না।

কলাইয়ের রুটি এখন আর শুধু বিশেষত্বের অহংকার করার মতো ব্যাপার হয়ে আছে তা নয় এখন বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে বিভিন্ন জায়গায় বড় রাস্তার পাশে বসেছে প্রায় ৪০টি কলাইয়ের রুটি বিক্রির দোকান, হয়তো পাড়ার ভিতরে গলির পাশে আরও দোকান থাকতে পারে। পুরো রাজশাহী শহর ঘুরে দেখলে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব দোকান দেখা যায়। চারপাশে শক্ত কিংবা ছেড়া পলিথিন, পরনের কাপড় দিয়ে চারপাশ ঘিরে ফেললেই দোকান বসানো যায়। সচেতনভাবেই সম্ভাব্য ক্রেতার কথা ভেবে জায়গা হিসেবে রুটি বিক্রেতারা বেছে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইনগট, সরকারি হাসপাতালের গেট, বাসস্ট্যান্ড, রিক্সাস্ট্যান্ড আর বিভিন্ন ব্যস্ত মোড়। সন্ধ্যার পর রাস্তার পাশে নিভু নিভু মাটির চুলা পড়ে থাকে। দোকানঘরের কোনো অস্তিত্ব সন্ধ্যার পর আর থাকে না। আবার সকালের অপেক্ষা।

যারা রাজশাহীর আদি বাসিন্দা তারা সাধারণত শীতকালে এই রুটি বাসায় বানিয়ে খেয়ে থাকেন। কিন্তু গত পাঁচ-ছ বছর ধরে সারা বছরই এই রুটি শহরে বিক্রি করছেন মহিলারা। এদের কারো বাড়ি রাজশাহী শহরেই, কারো বাড়ি শহরের বাইরে চোদ্দপাই, আড়ানি, চস্সনপুর। কাজে নামার আগে এদের বেশিরভাগই জানতেন না কলাইয়ের রুটি এই অঞ্চলের বিশেষত চাঁপাই-নবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী খাবার। শুধু এটুকু জানতেন দুটো কলাইয়ের রুটি খেলে সারাদিন আর কিছু খাওয়ার দরকার পড়ে না। একটুখানি খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার আশায় ছোট্ট একটা জায়গা ঘিরে নিয়ে বসে পড়েছেন রুটি বানাতে। কথা বলে জানা যাবে এদের কারো স্বামী মারা গেছেন, কারো স্বামী তাদের ছেড়ে গেছেন, কেউ কেউ সংসারে সহযোগিতা করার জন্য এই কাজে বসেছেন।

কিন্তু হঠাৎ এতোজন এই পেশার সাথে জড়িত হবার কারণ কি? নুরুন্নাহারের কণ্ঠে প্রায় সকলের উত্তর পাওয়া যায়, "আমার বাড়ি গাইবান্ধা জিলা ছিলো। অভাব এখানে ট্যানে আনছে। বাসা বাড়িত কাজ করবার পারতাম কিন্তু মাস গ্যালে তবে না তোমরা ২০০ ট্যাকা দিবা। বস্তির একজন কইলো রুটি বানানের কাজ করতে। তারপর থোন এটিই আছি। খরচ বাদ দিলে দিনে ৩০-৫০ টাকা আয় হয়। কারো হুকুম শোনা লাগে না, সারাদিনমান পানি ঘাটা লাগে না। নিজের মতো কাম করি, ইচছা না হলে করি না। কেউ মাথার উপ্রে ছড়ি ঘোরানের নাই।" জেবুন্নেসা, নসিমন, বিলকিস সকলের এই একই কথা। যাই হোক, যেমনই হোক তাঁদের নিজের ব্যবসা। কারো সামনে হাত না পেতে নিজেদের খাওয়া-পরা চালাতে পারছেন, বাচচার মুখে খাবার দিতে পারছেন।

যারা রুটি বানান তাদের মধ্যে নসিমনের বয়স মনে হয় সব চেয়ে বেশি, ষাটের ওপরে। মাথার সবকটা চুল পেকে গেছে নিজের খাদ্যসংস্থানের পিছনে। কবে থেকে রুটি বানাচেছন আজ আর তা মনে করতে

পারেন না। তাঁর স্বামী মারা গেছেন দেশ স্বাধীন হবত্ম আগে। তারপর তিন সন্তান নিয়ে পথে নামেন, শুরু করেন রুটি বানানোর কাজ। অন্য কিছু না ভেবে রুটি কেন বানাতে শুরু করলেন জিজ্ঞাসা করতেই একমনে পিঁড়িতে রুটি বানাতে বানাতে বলতে শুরু করলেন গোড়ার কথা। "হাতে টাকা নাই, পেটে ভাত নাই, সাথে তিন তিনটা ছাওয়াল। অদেরকে রাইখ্যা বাসাবাড়িতে কাজ করা যায় না। তখন এতো কাজের লোক নেয়ার চলও ছিলো না। কিন্তু চলতে তো হবে। ভাবতে থাকি কি কইর‌্যা দিন চালাবো। তখন মুনে হলো যারা দুর থ্যাকা কাজে আসে তাদেরকে রুটি বানিয়ে খাওয়ালে টাকা পাবো। আর সেডা যদি হয় কালাইয়ের রুটি তালে কাম করা লোকে বেশি খাবো। এই রুটি তো দুইডা খ্যালে সারাদিন খিদা লাগে না।"

শহরে কাজ করতে আসা লোকেদের কথা ভেবে রুটি বানানো শুরু করলেও আজ তার কাছে রুটি খেতে আসে দিনমজুর, রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবরাও। দুইভাগ কলাইয়ের আটার সাথে একভাগ চালের গুড়া মিশিয়ে খড়ির চুলায় মাটির তাওয়াতে রুটি সেকে নিতে হয়। রুটির সাথে খাওয়ার জন্য দিতে হয় লবন, মরিচের মসলা আর সরিষার তেল। রুটি বিক্রেতারা প্রায় সবাই বললেন দিনে তিন কেজি আটা এমনিতেই শেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো দিন একটু বেশিও লাগে। একটা রুটি বিক্রি হয় পাঁচ টাকায়। পুরো রাজশাহীতে একই দাম। সব খরচপাতি বাদ দিয়ে এঁদের হাতে দিনে ৪০ থেকে ৫০ টাকা থাকে। এই কাজ করেই নসিমন দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ছেলে অল্প লেখাপড়া করে এখন মাইক্রো চালায়।

বরেন্দ্র জাদুঘরের সামনের একটি রুটির দোকানে ঢুকে দেখা গেলো তিনজন বসে রুটি খাচেছন। পেশায় তাদের দুইজন রিক্সাচালক আর একজন বরেন্দ্র জাদুঘরের দারোয়ান। কথা হলো বরেন্দ্র জাদুঘরের দারোয়ানের সঙ্গে। দুপুরে খাওয়ার জন্য বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসলেও মাঝে মাঝেই তিনি দুপুরে কলাইয়ের রুটি খেয়ে নেন। এটা খেতেও মজা আর পেটে অনেকক্ষণ থাকে। সহজে ক্ষুধা লাগবে না। আর দামটাও যে কম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যারয়ের মেইন গেটের সামনে সারি বাধা সাতটি দোকান। এরমধ্যে একটি দোকানে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে রুটি খেতে দেখা গেলো। কথা হলো বিক্রেতা শামসুন্নাহারের সঙ্গে। তাঁর কথা জানতে এসেছি শুনে অবাক হলেন। অনেক দ্বিধা, কিছুটা ভয় নিয়েই কথা শুরু করলেন। তার স্বামী কোনো কাজ করেন না। তারপরও বিয়ের পর শশুরের বাড়িতে ভালোই দিন কাটতো। শশুর মারা গেলে বুঝতে পারেন স্বামীর দুবেলা খাবার দেবার ক্ষমতা নেই। কোলে একটি মেয়ে, মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তখনই বড়ভাই এই দোকান করার পরামর্শ দেন। ৩০০ টাকা পুঁজি করে এই দোকান করেন। এরপর দুবেলা খেয়ে একটু একটু টাকা জমিয়ে, কিছু ঋণ নিয়ে স্বামীকে একটা রিক্সা কিনে দেন। কিন্তু রিক্সা না চালিয়ে ঢাকা পালিয়ে গিয়ে সে রিক্সা বেচে নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসে। এখন পর্যন্ত শামসুন্নাহার সেই ঋণের মাসুল দিচেছন। তারপরও নিজের আয়রোজগার থাকায় তার চেহারায় একটা প্রশান্তি আছে। সন্তান নিয়ে বাবা মার ঘরে ফিরে না গিয়ে নিজে কাজ করে চলতে তো পারছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব মিস্ত্রিরা কাজে আসে, এই এলাকায় যে রিক্সা চালকেরা দুপুর সময়ে ভাড়া টানেন তারাসহ অনেক ছাত্রছাত্রী তার দোকানে রুটি খেতে আসে। দর্শণ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী রুমি মসলার ঝালে চোখ ভিজিয়ে বললেন তিনি প্রায় বন্ধুদের নিয়ে রুটি খেতে আসেন। তাঁর বাড়ি চাঁপাই নবাবগঞ্জের রহনপুর থানায়, বলেন, "শীতের সকাল মানেই চুলার পাড়ে মায়ের পাশে বসে কলাইয়ের রুটি খাওয়া।

গরম রুটি ঝালমরিচ দিয়ে খাওয়ার মজা যে খায় নি সে বুঝবেই না। হলে থাকার কারণে তো আর এই সুযোগ পাই না, তাই মাঝে মাঝেই এখানে চলে আসি।" রুমির মতে খাটুনির তুলনায় রুটির দামটা বেশ কম।

দেখা ৪০টির মতো দোকানের মধ্যে একটি মাত্র দোকানে রুটি বানান একজন পুরুষ। নাম রুবেল। তার বাড়িও চাঁপাই নবাবগঞ্জের রহনপুরে। উপশহর এলাকায় বছর দুই হলো রুবেল রুটি বানানো শুরু করেছেন। তার দোকানের চেহারা, পরিবেশ, ব্যবসার ধরণ সবই অন্যান্য দোকানগুলো থেকে আলাদা। চা বিস্কুটের দোকান চালাতে চালাতে দুইবছর আগে তাঁর মাথায় বুদ্ধি আসে কলাইয়ের রুটি বানানোর। বিকেল চারটে নাগাদ দোকানে গেলে দেখা যায় দুই চুলায় রুবেলের রুটি বানানোর ব্যস্ততা। সন্ধ্যা নেমে না আসা পর্যন্ত কথা বলার সময় সুযোগও পান না। একহাতে রুটি তৈরি, সেকা, মসলা মাখানো চলছে। কেউ সেখানে বসে খাচেছন, কেউ খাওয়ার অপেক্ষায় আছেন আবার কেউ বাসায় নিয়ে যাবেন বলে অর্ডার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চা বিস্কুটের সঙ্গে কলাইয়ের রুটি যোগ হবার পর থেকে তার দোকানে লোকসমাগম অনেক বেড়ে গেছে বলে জানালেন।

রাস্তার পাশে সরকারের জায়গায় দোকান বসানোর জন্য এসব রুটি বিক্রেতাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। রাস্তার পাশ থেকে অবৈধ দোকান উচেছদ অভিযান চললেই তাদেরকে উঠিয়ে দেয়া হয়। তখন চার পাঁচ দিন ঘরে বসে থাকতে হয়। পরিস্থিতি অনুকূলে এলে মনে ভয় নিয়ে আবার নতুন করে শুরু করা। তারপরও তাঁরা রুটি বিক্রি করে অনেক ভালো আছেন বলে জানান। আর যাই হোক চেয়ে খাওয়ার চেয়ে নিজের পরিশ্রম অনেক সম্মানের। কলাইয়ের রুটি তাদের কাছে কোনও ঐতিহ্যবাহী খাদ্য না, বেঁচে থাকার অবলম্বন।